সংবাদ

তারিখ ... 03 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সৃষ্টিশীল শিক্ষার সন্ধানে

পুলক বড়ুয়া

প্রতিষ্ঠান মানে কী? যেখানে যুক্ত হওয়া যাবে, সদস্য হওয়া যাবে। আসর জমানো যাবে, যা সরগরম হয়ে উঠবে। যেখানে বেড়ানোর মতো ফাঁকা জায়গা থাকলে ভালো লাগবে। আমরা তাকে আঙিনা বলতে পারি। বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অঙ্গন হলে তার জন্য চাই লাগোয়া একটি বেশ উন্মুক্ত চত্বর। এবং এটা তো সত্যি যে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য তার ধরন অনুযায়ী একটি লাগসই পরিসর খুবই ফলপ্রসূ।

বিশেষভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খেলার মাঠ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য যা অনিবার্য নয়। কিন্তু, এখানে একান্তভাবে, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ময়দান চাই, উন্মুক্ত প্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণ চাই। যেখানে তারা জমায়েত হতে পারবে। খেলাধুলা করতে পারবে। মেলা, উৎসব করতে পারবে। কারণ এগুলো শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয়। তার প্রয়োজনীয় দিক। সারা বছর তো শুধু পড়া মুখস্থ ও পরীক্ষা দিলেই চলে না। সময়ে-সময়ে এবং বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হতে হয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার জন্য যার বিকল্প নেই। প্রতিদিনই তো তারা চায় কিছু না কিছু আন্তঃ ও বহিঃক্রীড়ায় মিলিত হতে। এতে পাঠগ্রহণে তাদের মনোযোগ বাড়ে। মন কাড়ে। এটি পাঠের সহায়ক। একঘেয়েমি দূর করে।

মনোজগত গঠনের উপায় ও মনোবিকাশের দূরবস্থার কথা ভেবেই সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তার স্মৃতিবাহী দুটি স্কুল ও কলেজের একটি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠান দুটির মাঠের সংরক্ষণের কথা বলেছেন। এটি বাধ্যবাধকতা হিসেবে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়লে আরও ভালো হয়। কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই স্কুল-কলেজ গড়ে তুলছেন। আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, প্রকৃত সৃজনশীল হয়ে গড়ে ওঠার কোনো জায়গা নেই।

আমাদের বহু বহু- শতবর্ষী বা এরকম- সুপ্রাচীন বিদ্যালয়গুলো লক্ষ্য করুন। তার ভবনের যত না জুড়ে আছে, বিশাল ফাঁকা আছে তার আরও বহু দূর জুড়ে। কী গ্রামে, শহরাঞ্চলে। দেশজুড়ে। অথচ আজ? নামে বিদ্যাপীঠ। কিন্তু কোনটি তো বিপণী বিতানের ওপরে গড়া। বাড়ি ভাড়া করা। বাণিজ্য করা। সওদাগরী করা। টোকা- বের হওয়া- কোন মতে বসার জায়গাটুকু থাকলেই চলবে। বিনিময়ে ভর্তি-বেতন-পরীক্ষা নানা ছলছুঁতোয় কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি। আবার যেতে হবে, কোচিং। কোনোমতে, নাকে-মুখে কিছু গুঁজে। এ দৃশ্য কেবল গৃহে নয়, পথিমধ্যেও চোখে পড়ে। কীসের আনন্দ, বিনোদন। তার ফুরসৎ কই। জায়গা কই। বেড়জোর বছরান্তে- একদিন অন্য কারও ময়দানে, কোথাও- তাও আবারও আরেকটি ভাড়া করা জায়গায়। চোখে পড়ে শুধু বিদ্যার বেসাতি। এভাবে, প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ পাঠশালা গড়ে উঠছে।

আমাদের যাবতীয় জোর বইপত্তর, সেই সংক্রান্ত পরীক্ষায়, তার ফলাফলে। এমনিতেই শিশুদের পরীক্ষাভীতির অন্ত নেই। জীবনের শুরুতে 'ভর্তি পরীক্ষা' থেকে 'পরীক্ষা' শব্দটি উঠে গিয়েছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কৌলিন্যে। কী অমানুষিক, অমানবিক ছিল সেই 'ভর্তি যুদ্ধ'। সেই ত্রাহি ত্রাহি ও নাকাল অবস্থা থেকে সম্প্রতি রেহাই পেয়েছে আমাদের কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা ও তাদের উৎকণ্ঠিত অভিভাবকবৃন্দ।

শিক্ষার্থী মাত্রেই 'পরীক্ষা'কে স্বাচ্ছন্দ্যে নেয় না। কোথাও না, কোন দেশেই না। এজন্য, ফিনল্যান্ডে ১৮ বছরের দিকে গিয়ে প্রথমবারের মত মাত্র একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। বা বহু দেশেই তা বহুভাবেই রাখা হয়েছে যথেষ্ট সহনীয় মাত্রায়। অধুনা আমাদের এখানেও সারা বছরের তিনটির জায়গায় দুটিতে আনা হয়েছে। কারণ, শিক্ষার্থীরা যতটা না সানন্দে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে, তারা সব ছেড়েছুঁড়ে, দমবন্ধ করা, রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চায় না। তারা পছন্দ করে, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, গানবাজনা, গল্প-গুজব, সংস্কৃতিচর্চা, আড্ডা, বিনোদন। এগুলোকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কেননা, পড়ালেখা সবাই পছন্দ করেন। এগুলোকে করেন না। নিরর্থক ভাবেন। অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। শুধু রাতদিন পাঠ্যবই নিয়ে থাকলে, একবেলা স্কুল কামাই না করলে, মুখস্থ বিদ্যা, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলে- সেই ভালো সন্তান। আমরা ভাবি। আমরা ভাবি, আমাদের পুত্রগণ, কন্যাগণ সনদসর্বস্ব হলেই চলবে। আমাদের একটি সোনালি সনদ চাই। আর কিছু চাই না। তাদের স্বাস্থ্যের কথা সেভাবে ভাবি না। তাদের মনমানসিকতা সুগঠিত হচ্ছে কি-না, সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে কি-না, সেটা ভাবার ফুরসৎ নেই। কেবল, পড়া। পড়া। আর পড়া। খেলার সময় খেলছে কিনা, সেদিকে খেয়াল নেই। সে প্রকৃতপক্ষে ভালো মানুষ হয়ে উঠছে কিনা, ভাবি না। প্রচলিত ভাষায় তথাকথিত অর্থে, ভালো ছাত্র, ভালো ছাত্রী হলেই, আমরা আহ্লাদে আটখানা। গর্বিত পিতা-মাতা মাত্র। ধন্য স্কুল, ধন্য সরকার। রাষ্ট্র সার্বিক একথাগুলো না ভেবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের অনুমতি দিয়ে চলেছে। সেখানে এতটুকু নড়াচড়া করার, নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই। পরিস্থিতি হাঁস-মুরগির খামারের মতো। দেশের মানুষ তো আর চোখে ঠুলি পরে নেই, এ পর্যন্ত আপাদমস্তক শিক্ষা নিয়ে কত কসরৎ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা, বিদ্যালয় ও পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবক ও বেতন কোথাও সমন্বয় নেই। তার মধ্যে, সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের পড়াশোনা যেন এখন কেবলি পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সবার নজর ফলাফল তথা ভর্তির দিকে। অথচ, এই সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সময়ের পুস্তক ও পরীক্ষাসর্বস্ব জীবনের বাইরেও, আরেকটা পাঠশালা আছে- প্রকৃতির পাঠশালা, পৃথিবীর পাঠ, যেখান থেকে আমরা জীবনের প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করি, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার যথার্থ সুযোগ যেখানে নিহিত, তা আমাদের কাছে আজ একদম গুরুত্বহীন। এতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার না উন্নতি হয়েছে, না আমাদের শিক্ষার্থীদের মান বেড়েছে। এগুলো আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার। অথচ আমাদের শৈশব কতো না মধুর, কৈশোর কতো না আনন্দময়, তারুণ্য কতো না রাঙা-উজ্জ্বল! সে কী নিজগৃহে, শিক্ষালয়ে- সর্বত্র চার দেওয়ালের মাঝে কেবলি পুঁথিকেন্দ্রিক পরীক্ষাসর্বস্ব- ত্রাসের হাতে বন্দি ও বলি হতে এসেছে? জীবন কী এককেন্দ্রিক, বৃত্তবন্দী? তার কী আর কোন স্বাদ-আহ্লাদ নেই? আমাদের চাহিদার কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে সে? আমরা কেবলি তাকে গলাটিপে হত্যা করবো? পুঁথি, পরীক্ষা ও বাস্তব-বস্তুবিশ্বের সঙ্গে আমরা সাংঘর্ষিক করে তুলিনি। বাস্তব পৃথিবী থেকে কাউকে বিমুখ করে রাখা যায় না। দুর্ভাগ্য, এই আন্তর-সত্য আমরা কখনোই উপলব্ধি করতে পারি না।

সত্যি, কী অদ্ভুত আমাদের শিক্ষার বহর ও বাহার! না পারছে, বইয়ের ভারী ব্যাগ বহন করতে, এতসব ভরাট পুঁথিপত্রের ভরপুর পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ধকল আর তার গালভরা অসংখ্য-অজস্রজনের ভালো ফলাফলের বুলি নিয়ে বিড়ম্বনা সইতে। আমাদের শিক্ষায় এই বই, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা নিয়ে বিচিত্র টানাপড়েন চলছে, যা আমাদের সারাক্ষণ বিব্রত করছে।

এজন্যে, পাঠ্য বই থেকে পরীক্ষা-ফলাফল-ভর্তি পর্যন্ত একটি সমন্বয় ও সংস্কার চাই। অধ্যয়ন করুক সবকিছু। কিন্তু, সেখান থেকে পরীক্ষার জন্য চয়ন করবো কিছু কিছু। এবং কিছু কিছু নির্বাচিত ওই বই পুস্তকের আবার সবকিছু নয় শুধু কিছু কিছু বিষয়। এই যদি হয় সারা বছরের পাঠ ও পরীক্ষা এবং পাবলিক পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত ফলাফল ও ভর্তি পরীক্ষা- তাহলে, বিরাজমান দুরবস্থা থেকে জাতি রেহাই পাবে। শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও বিস্তৃতভাবে সানন্দে পাঠগ্রহণের সুযোগ পাবে। বিষয়টি দাঁড়াবে এমন- এই যেমন, শিক্ষা জীবনের প্রায় শেষ ও সর্বোচ্চ ধাপে এই যে আজকে প্রবেশ করছে, স্নাতক পর্বে, প্রয়োগ ও প্রযুক্তিমূলক বিশেষায়িত শিক্ষালাভে- যেমন ধরুন, চিকিৎসা বিদ্যা ও প্রকৌশল বিষয়ক, তখন ভর্তিযুদ্ধে কিন্তু ওরা এতসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ও মুখোমুখি হয় না।

শৃঙ্খল মুক্তিই শিক্ষা। তারা যদি শিক্ষার নামে অবরুদ্ধ, উপদ্রুত হয়ে পড়ে- তাহলে, তা জায়গামতো কাজে আসবে না। কেবল বইয়ের মধ্যে ঠেসে ধরা, কোচিং গাইড বই, মুহুর্মুহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা- এই লাগাতার অবরোধের মতো জ্বালাও-পোড়াও হাঁসফাঁস পরিস্থিতি কারো কাম্য নয়।

আগে আমাদের জ্ঞানপীঠগুলোতে যুগপৎ অবকাঠামোগত ও সুষ্ঠু শিক্ষা-কৌশলগত আমূল গুণগত পরিবেশ যুক্ত হোক। তাহলেই, আমাদের আগামী প্রজন্ম সৃষ্টিশীলতার স্বাদ পাবে। আমাদের সহজাত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে, দক্ষ-মেধাবীরা উন্মোচিত হবে- আমাদের জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। আমাদের শিক্ষা ও তার ফলশ্রুতি হবে কাঙ্ক্ষিত ও সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। সেখানে কোন অসম-অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা থাকবে না। স্বদেশ ও বিশ্বে একটি স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত, যুগোপযোগী প্রার্থিত জাতি ও তার মনো ও বস্তুবিশ্ব চরিতার্থতা লাভ করবে। যাকে আমরা বলতে পারব সৃষ্টিশীলতার ফসল, সৃষ্টিশীল শিক্ষার শস্য।

একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয়। তার প্রয়োজনীয় দিক। সারা বছর তো শুধু পড়া মুখস্থ ও পরীক্ষা দিলেই চলে না। সময়ে-সময়ে এবং বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হতে হয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার জন্য যার বিকল্প নেই। প্রতিদিনই তো তারা চায় কিছু না কিছু আন্তঃ ও বহিঃক্রীড়ায় মিলিত হতে। এতে পাঠগ্রহণে তাদের মনোযোগ বাড়ে। মন কাড়ে। এটি পাঠের সহায়ক। একঘেয়েমি দূর করে।

[লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক]
pulak.next@gmail.com